অধ্যায় - ৯

রওনা হওয়ার সময় বাবার আজ্ঞা পালন এবং অবজ্ঞা করার পরিণামের কয়েকটি উদাহরণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও তার আবশ্যকতা, ভক্তদের (তর্খড় পরিবারের) অভিজ্ঞতা।

গত অধ্যায়ে শুধু এতটাই সংকেত দেওয়া হয়েছিল যে, ফেরবার সময় যাঁরা বাবার আদেশ পালন করেছিলেন, তাঁরা কুশলে বাড়ী পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং যাঁরা অবজ্ঞা করেছিলেন তাঁদের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই অধ্যায়ে এই সত্যটি কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে বিস্তৃত আকারে বোঝান হবে।

শিরডী যাত্রার বিশেষত্ব ঃ-

শিরডী যাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল যে বাবার অনুমতি ছাড়া কেউ শিরডী থেকে প্রস্থান করতে পারত না এবং যদি কেউ দুভার্গ্যবশতঃ বাবার আজ্ঞার অবজ্ঞা করে যাত্রা করত, তাহলে যেন সে অনেক কষ্টকে আহ্বান করত। আবার এও ঠিক যে, যদি কাউকে বাবা শিরডী থেকে রওনা হওয়ার আদেশ দিতেন তাহলে তার আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকবার সুযোগ হত না। যখন ভক্তরা রওনা হওয়ার সময় বাবাকে প্রণাম করতে যেত, তখন বাবা ওদের যা আদেশ দিতেন, সেটা পালন করা নিতান্তই আবশ্যক হয়ে দাঁড়াত। এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

তাত্য়া কোতে পাটীল ঃ-

একবার তাত্য়া কোতে টাঙ্গায় চড়ে কোপর গ্রামের বাজারে যাচ্ছিলেন। ওঁর একটু তাড়া ছিল। সেই শীঘ্রতাতেই মস্‌জিদে আসেন। বাবাকে প্রণাম করে বলেন- "আমি কোপর গ্রামের বাজারে যাচ্ছি।" বাবা তার প্রত্যুত্তরে বললেন- "অত তাড়াহুড়ো কোরো না। বাজার যাওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করো, গ্রামের বাইরে যেও না।" কিন্তু ওঁর তীব্র ইচ্ছে দেখে বাবা বলেন- "আচ্ছা, এক কাজ করো, শামাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" বাবার আদেশ না মেনে তাত্য়া তক্ষুনি টাঙ্গায় চড়ে বেরিয়ে পড়েন। টাঙ্গার দুটি ঘোড়ার মধ্যে একটা (যার দাম প্রায় তিনশো টাকা ছিল) খুবই চঞ্চল ও দ্রুতগামী ছিল। সাঁওলী বিহীর গ্রাম পার করতেই ঘোড়াটি প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে লাগল। অকস্মাৎ কোমরে

মোচড় লাগতে সে ওখানেই পড়ে যায়। যদিও তাত্যার বেশী ব্যথা লাগেনি, কিন্তু নিজের সাই মায়ের আদেশের কথা অবশ্যই মনে পড়ে যায়। আরেকবার কোল্হার গ্রামে যাওয়ার সময় উনি বাবার আদেশ অবজ্ঞা করেন এবং উপরে বর্ণিত ঘটনার মতই ওনাকে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়।

এক ইউরোপীয় মহাশয় ঃ-

একবার বম্বের এক ইউরোপীয় মহাশয়, নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে কোন বিশেষ কাজে শিরডী আসেন। ওঁকে একটা বড় তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হয়। উনি বাবার সামনে নত হয়ে তাঁর হাতে চুমু খেতে চাইছিলেন। তাই তিনবার মস্জিদে সিঁড়ি চড়তে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাবা ওকে নিজের কাছে আসতে দেন না। ওঁকে সভা-মণ্ডপেই বসতে এবং ওখানে থেকেই দর্শন করতে বলা হয়। এই বিচিত্র অভ্যার্থনায় অপ্রসন্ন হয়ে ভদ্রলোক শীঘ্রই শিরডী থেকে প্রস্থান করবেন বলে স্থির করেন এবং রওনা হওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য মস্জিদে আসেন। বাবা ওঁকে পরের দিন রওনা হতে ও উৎকণ্ঠা না করতে পরামর্শ দেন। অন্য উপস্থিত ভক্তরাও ওঁকে বাবার আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উনি সবার কথা অবজ্ঞা করে টাঙ্গায় চড়ে রওনা হয়ে যান। কিছুদূর পর্য্যন্ত ঘোড়াগুলি ভালভাবেই চলল। কিন্তু সাঁওলী বিহীর পার হতেই একটা সাইকেল সামনে থেকে আসতে দেখে ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে দ্রুতগতিতে দৌড়তে লাগল। ফলে টাঙ্গা উল্টে যেতেই ভদ্রলোক নীচে পড়ে যান এবং কিছু দূর টাঙ্গার সাথেই রাস্তায় রগড়ানি খান। লোকেরা তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে নেয়। ওঁকে কোপর গ্রামে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে ভক্তরা শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, বাবার আদেশ অবহেলা করলে কোন-না-কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতেই হয়। যারা বাবার আজ্ঞা পালন করে, তারা নির্বিঘ্নে ও আনন্দে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

ভিক্ষাবৃত্তির আবশ্যকতা ঃ-

এবার আমরা ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্নের উপর বিচার করব। অনেকের মনে এই সন্দেহ উৎপন্ন হতে পারে যে, বাবা এত মহান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও আজীবন ভিক্ষাবৃত্তি করে কেন জীবন নির্বাহ করেন? এই প্রশ্নের উত্তর দুটি দৃষ্টিকোণ সামনে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম দৃষ্টিকোন - ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করার অধিকারী কে?

শাস্ত্রানুসারে যাঁরা তিনটি মুখ্য আসক্তি যথা - কামিনী, কাঞ্চন ও কীর্তি ত্যাগ করেছেন, আসক্তি মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তাঁরাই ভিক্ষাবৃত্তির উপযুক্ত অধিকারী। কারণ তাঁরা নিজের বাড়ীতে খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা করতে পারেন না। অতএব তাঁদের ভোজনের ভার গৃহস্থদের উপর দেওয়া হয়েছে। শ্রী সাইবাবা না তো গৃহস্থ ছিলেন আর না বানপ্রস্থী। বাল্যকাল থেকে তিনি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। তাঁর এইটাই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁর বাসস্থান। তিনি স্বয়ং বিশ্ব পালনকর্তা ভগবান শ্রী বাসুদেব ও পরমব্রহ্ম। অতএব তিনি ভিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ অধিকারী!

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ -

পাঁচটি পাপ ও তাদের প্রায়শ্চিত্ত ঃ- সবাই জানে যে, ভোজন সামগ্রী বা রান্নার জন্য গৃহস্থকে পাঁচ রকমের ক্রিয়া করতে হয় - ১) পেষা ২) চূর্ণ করা ৩) বাসন মাজা ৪) ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা ৫) উনুন জ্বালানো। এই ক্রিয়াগুলির পরিণামস্বরূপ অনেক পোকা-মাকড় ও জীব মরে যায় এবং এইভাবে গৃহস্থকে পাপের ভাগী হতে হয়। এই পাপগুলির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শাস্ত্রতে পাঁচ রকমের যজ্ঞ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন - ১) ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন - ব্রহ্মাকে অর্পণ করা বা বেদ অধ্যয়ন করা ২) পিতৃযজ্ঞ - পূর্বপুরুষদের দান ৩) দেবযজ্ঞ - দেবতাদের নামে বলি ৪) ভূতযজ্ঞ - প্রাণীদের দান ৫) মনুষ্যযজ্ঞ - মানুষদের (অতিথিদের) দান।

যদি এই কর্মগুলি বিধিপূর্বক শাস্ত্রানুসারে করা হয়, তাহলে মন শুদ্ধ হয়ে জ্ঞান ও আত্মানুভূতির প্রাপ্তি সুলভ হয়ে যায়। বাবা দ্বারে-দ্বারে গিয়ে গৃহস্থদের এই পবিত্র কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতেন। তারা খুবই ভাগ্যবান, যারা বাড়ী বসে বাবার দ্বারা দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল।

ভক্তদের অভিজ্ঞতা ঃ-

এবার একটি মনোরঞ্জক বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন **"যে আমায় ভক্তিপূর্বক কেবল একটা পাতা, ফুল, ফল বা জল অর্পণ করে আমি সেই শুদ্ধচিত্তের ভক্তের দ্বারা অর্পিত বস্তু সানন্দে স্বীকার করি।"**

যদি ভক্তদের শ্রী সাইবাবাকে সত্যি-সত্যি কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছে হত এবং অর্পণ করার কথা তারা যদি ভুলে যেত তাহলে বাবা তাদের কিংবা তাদের বন্ধুদের দ্বারা ঐ উপহারের কথা মনে করিয়ে দিতেন এবং সেটা দিতে বলতেন। বলাবাহুল্য,

উপহার পাওয়ার পর তাদের আশীষও দিতেন। এই ধরনের কিছু ঘটনা নীচে বর্ণনা করা হচ্ছে।

তর্খড পরিবার (পিতা ও পুত্র) ঃ-

শ্রীরামচন্দ্র আত্মারাম উপনাম বাবাসাহেব তর্খড প্রথমে প্রার্থনা সমাজী ছিলেন। তবুও তিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। একবার উনি স্থির করেন যে, ছেলে ও মা গরমকালের ছুটি শিরডীতেই কাটাবে। কিন্তু ছেলের বান্দ্রা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ওর ভয় ছিল যে, শ্রীবাবার পূজো নিয়ম মত হতে পারবে না। পিতা প্রার্থনা সমাজের রীতি অনুসরণ করেন, তাই খুব সম্ভব শ্রী সাইবাবার পূজা ইত্যাদির খেয়াল রাখতে পারবেন না। কিন্তু পিতা আশ্বাস দেন যে, বাবার পূজোয় কোন বাধা পড়বে না এবং মা ও ছেলে শুক্রবার রাতে শিরডী অভিমুখে রওনা দেয়। পরের দিন শনিবার। শ্রীমান তর্খড ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে, স্নানাদি সেরে, পূজো শুরু করার আগে, বাবাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করেন- "হে বাবা। আমি ঐ ভাবেই আপনার পূজো-অর্চনা করব যেমনটি আমার ছেলে করত। কিন্তু কৃপা করে এটা একটা শারীরিক কর্মের সীমায় আবদ্ধ রাখবেন না।" এই বলে উনি পূজো আরম্ভ করেন এবং মিছরি নৈবেদ্য অর্পণ করেন, যেটা দুপুরের খাবারের সাথে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হয়। সেই সন্ধ্যা ও পরের দিন (রবিবার) নির্বিঘ্নে কেটে যায়। সোমবার দিন উনি অফিস যান, কিন্তু সেদিনটাও নির্বিঘ্নে কেটে যায়। শ্রী তর্খড জীবনে কখনো এইভাবে পূজো করেননি। ওঁর এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে, ছেলেকে দেওয়া কথামত পূজো যথারীতি সন্তোষজনক ভাবে চলছে। পরের দিন (মঙ্গলবার) রোজকার মত পূজো করে উনি অফিস চলে যান। দুপুরে বাড়ী ফিরে খেতে বসে থালায় প্রসাদ না দেখতে পেয়ে রাঁধুনিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে ওঁকে জানায় যে, আজ ভুলবশতঃ উনি নৈবেদ্য অর্পন করেননি। এই কথা শুনে উনি তক্ষুনি আসন থেকে উঠে বাবাকে দণ্ডবত প্রণাম করেন। সঠিক পথ প্রদর্শন না করার জন্য ও পূজোটিকে কেবল শারীরিক পরিশ্রম পর্যন্ত সীমিত রাখার জন্য বাবার উপর দোষারোপ করেন। সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে উনি একটা চিঠি ছেলেকেও লেখেন এবং ওকে অনুরোধ করেন- "এই চিঠিটা বাবার শ্রীচরণে রেখে ওঁকে জানিও যে, এই অপরাধের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।" এই ঘটনাটি দুপুর বেলায় বান্দ্রাতে ঘটেছিল। ঠিক ঐ সময়ই শিরডীতে মধ্যাহ্ন আরতি শুরু হবে, এমন সময় বাবা শ্রীমতি তর্খডকে বলেন- "মা, আমি কিছু খাবার পাওয়ার আশায় তোমার বাড়ী (বান্দ্রাতে) গিয়েছিলাম। দরজায় তালা দেখেও কোনরকমে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ

করি। কিন্তু সেখানে দেখি মহাশয় (শ্রী তর্খড) আমার জন্য কিছুই (খাবার) রেখে যাননি। তাই আমি ক্ষুধার্তই ফিরে এসেছি।" কেউই বাবার কথার অভিপ্রায় বুঝতে পারল না। কিন্তু শ্রী তর্খডের ছেলে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝে গেল যে, নিশ্চয় বান্দ্রাতে বাবার পূজো্য কোন ভুল হয়ে গেছে। তাই ও বাবার কাছে অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল। কিন্তু বাবা ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না এবং শিরডীতে থেকে সেখানেই পূজো করার আদেশ দেন। শিরডীতে যা-যা ঘটল, তা একটা চিঠিতে লিখে ছেলে নিজের বাবাকে পাঠায় ও ভবিষ্যতে পূজোয় সাবধান থাকতে অনুরোধ করে। দুটো চিঠিই ডাক মারফত দুই পক্ষ একই সময় পায়। ঘটনাটি অত্যাশ্চর্য্য নয় কি?

শ্রীমতি তর্খড ঃ-

একবার শ্রীমতি তর্খড তিনটি জিনিষ-মশলা মাখানো বেগুন ভাজা, বেগুনের গোল টুকরো ঘিয়ে ভাজা ও পেঁড়া বাবার জন্য পাঠান। বাবা সেগুলিকে কিভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন, এবার আমরা সেটাই দেখব।

বান্দ্রার শ্রী রঘুবীর ভাস্কর পুরন্দরে বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীমতি তর্খড শ্রীমতি পুরন্দরেকে দুটো বেগুন দেন এবং শিরডী পৌঁছে উপরোক্ত দুটি ব্যঞ্জন বাবাকে অর্পণ করতে অনুরোধ করেন। শিরডী পৌঁছে শ্রীমতি পুরন্দরে প্রথম ব্যঞ্জনটি (ভূর্তা) নিয়ে মস্‌জিদে যান। বাবা ঠিক সেই সময়েই খেতে বসেছিলেন। বাবার বেগুনের 'ভূর্তা' খেয়ে খুবই ভাল লাগে এবং একটু-একটু সবাইকে বিতরণ করেন। কিছুক্ষণ পরই বেগুনের কাচরা (দ্বিতীয় ব্যঞ্জনটি) আনতে বলেন। রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় যে, বাবা বেগুন ভাজা চেয়ে পাঠিয়েছেন। এবার রাধাকৃষ্ণমাঈ তো খুবই বিপদে পড়লেন, কারণ বছরের এই সময় তো বেগুন পাওয়াও যায় না। বেগুন পাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এবার খোঁজ পড়ল যে, বেগুনের ব্যঞ্জনটি কে বানিয়ে এনেছিল। তখন জানা গেল যে বেগুন শ্রীমতি পুরন্দরে এনেছিলেন এবং ওঁকেই বেগুনটি ভেজে বাবাকে পরিবেশন করার ভার দেওয়া হল। এবার সবাই বাবার হঠাৎ বেগুন ভাজা খাওয়ার ইচ্ছার অভিপ্রায় বুঝতে পারল। বাবার সর্বজ্ঞতা দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে শ্রী গোবিন্দ বালারাম মানকর শিরডী গিয়ে সেখানে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে চাইলেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি শ্রীমতি তর্খডের

সঙ্গে দেখা করতে যান। শ্রীমতি তর্খড বাবার জন্য কিছু পাঠাতে চাইছিলেন। বাড়ীময় খোঁজাখুঁজির পরও একটা পেঁড়া ছাড়া কিছুই পেলেন না এবং পেঁড়াটাও নৈবেদ্য রূপে আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে সেই পেঁড়াটিই অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে বাবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবা সেটি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। শিরডী পৌঁছে গোবিন্দরাও বাবার দর্শন করতে যান, কিন্তু সেই সময় পেঁড়াটি নিয়ে যেতে ভুলে যান। বাবা কিছু বলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ও যখন গোবিন্দরাও পেঁড়া না নিয়েই বাবার দর্শন করতে যান তখন বাবা আর চুপ থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি আমার জন্য কি এনেছ?" উত্তর পান-"কিছু না।" বাবা আবার প্রশ্ন করেন এবং একই উত্তর পান। এবার বাবা স্পষ্ট শব্দে জিজ্ঞাসা করেন- "মা তোমায় (শ্রীমতি তর্খড) রওনা হওয়ার সময় কিছু দেননি?" এবার ওঁর পেঁড়ার কথা মনে পড়ে এবং খুবই লজ্জিত বোধ করেন। বাবার কাছে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চান। তক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে পেঁড়াটি এনে বাবার সামনে রাখেন। বাবা তক্ষুনি সেটি মুখে পুরে ফেলেন। এই ভাবে শ্রীমতি তর্খডের উপহার বাবা গ্রহণ করেন। "ভক্ত আমার উপর বিশ্বাস রাখে তাই আমিও গ্রহণ করে নিই।" - এই ভগবদবচন সিদ্ধ হল।

(বাবার) তৃপ্তিকর ভোজন ঃ-

একবার শ্রীমতি তর্খড শিরডী যান। দুপুরের খাবার প্রায় তৈরী এবং থালা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেই সময় একটি কুকুর ক্ষিধের চোটে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে সেখানে এসে দাঁড়াল। শ্রীমতি তর্খড তক্ষুণি উঠে গিয়ে রুটির একটা টুকরো কুকুরটাকে দেন। সে খুব আনন্দের সাথে সেটা খেয়ে নেয়। বিকেল বেলা যখন বাবা মস্‌জিদে এসে বসেন তখন তিনি শ্রীমতি তর্খডকে দেখে বলেন- "মা, আজ তুমি আমায় খুব ভালবেসে খাওয়ালে। আমার ক্ষুধার্ত আত্মা বড়ই তৃপ্তি পেল। সব সময় এইরূপ আচরণই কোর, কখনো-না-কখনো তুমি এর উত্তম ফল পাবে। এই মস্‌জিদে বসে আমি কখনো অসত্য ভাষণ করব না। সর্বদা আমার উপর এইরূপ অনুগ্রহই রেখো - এই কথাটা ভাল ভাবে মনে রেখো।" বাবার কথাগুলি উনি ঠিক বুঝতে পারেন না, তাই প্রশ্ন করেন- "আমি আবার কাকে খেতে দিলাম? আমি তো নিজেই অন্যদের উপর আশ্রিত। অন্যের কাছে অর্থের বিনিময়ে খাবার সংগ্রহ করি।" বাবা তাতে বলেন- "ঐ রুটিটা খেয়ে আমার হৃদয় তৃপ্ত হয়ে গেল এবং এখনো অবধি ঢেকুর উঠছে। **ভোজন করার আগে তুমি যে কুকুরটাকে দেখেছিলে এবং যাকে তুমি রুটির**

টুকরো দিয়েছিলে, সে ত আসলে আমারই স্বরূপ। এই রকম অন্যান্য প্রাণীরাও (বেড়াল, শূকর, মাছি, গরু ইত্যাদি) আমারই স্বরূপ- আমিই ওদের আকারে বিদ্যমান। যে এই সব প্রাণীদের মাঝে আমাকেই দর্শন করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তাই দ্বৈত বা ভেদ ভাব ভুলে তুমি আমার সেবা কোর।"

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

(-গীতা ৬/৩০)

এই অমৃততুল্য উপদেশ গ্রহণ করে শ্রীমতি তর্খড় হতবাক হয়ে গেলেন এবং ওঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এবং মন আনন্দে নেচে উঠল।

শিক্ষা :-

"সমগ্র প্রাণীদের মাঝে ঈশ্বর দর্শন করো" - এইটাই হচ্ছে এই অধ্যায়ের শিক্ষা। উপনিষদ, গীতা ও ভাগবৎ এই উপদেশ দেয় যে, সব প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বরের বাস, এই সত্যই প্রত্যক্ষ অনুভব কর। অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত ঘটনাটি ও অন্য আরো অনেক দৃষ্টান্ত এখনো লেখা বাকী আছে। বাবা স্বয়ং প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রস্তুত করে দেখাতেন যে কিভাবে উপনিষদের শিক্ষাগুলি আচরণবদ্ধ করা উচিত এই ভাবে শ্রী সাইবাবা শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষা দিতেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।